সাদাসিধে কথা

আমার বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

হুমায়ূন আহমেদ আমার বড় ভাই। তাকে নিয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেটাই লিখি তার মাঝে ব্যক্তিগত কথা চলে আসবে। আশা করছি পাঠকেরা সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

হুমায়ূন আহমেদ এই দেশের একজন বিখ্যাত মানুষ ছিল, বিখ্যাত মানুষেরা সবসময় দূরের মানুষ হয়। সাধারণ মানুষের কাছে তাদের পৌঁছানোর সুযোগ থাকে না। হুমায়ূন আহমেদ মনে হয় একমাত্র ব্যতিক্রম কম বয়সী তরুণেরা তার বই থেকে বই পড়া শিখেছে, যুবকেরা বৃষ্টি আর জোছনাকে ভালোবাসতে শিখেছে। তরুণীরা অবলীলায় প্রেমে পড়তে শিখেছে। সাধরণ মানুষেরা তার নাটক দেখে কখনো হেসে ব্যাকুল কিংবা কেঁদে আকুল হয়েছে।

(হুমায়ূন আহমেদ কঠিন বুদ্ধিজীবীদেরও নিরাশ করেনি, সে কীভাবে অপসাহিত্য রচনা করে সাহিত্য জগেক দূষিত করে দিচ্ছে তাদের সেটা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছে।) হুমায়ূন আহমেদ শুধু বিখ্যাত হয়ে শেষ করে দেয়নি, সে অসম্ভব জনপ্রিয় একজন মানুষ ছিল। আমিও সেটা জানতাম, কিন্তু তার জনপ্রিয়তা কতো বিশাল ছিল সেটা আমি নিজেও কখনো কল্পনা করতে পারিনি। তার পরিমাপটা পেয়েছি সে চলে যাবার পর। (আমি জানি এটি এক ধরনের ছেলেমানুষী, কিন্তু মৃত্যু কথাটি কেন জানি বলতে পারি না। লিখতে পারি না।)

ছেলেবেলায় বাবা-মা আর ছয় ভাইবোন নিয়ে আমাদের যে সংসারটি ছিল সেটি ছিল প্রায় রূপকথার একটি সংসার। একাত্তরে বাবাকে পাকিস্তানি মিলিটারিরা মেরে ফেলার পর প্রথমবার আমরা সত্যিকারের বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিলাম। সেই দুঃসময়ে আমার মা কীভাবে বুক আগলে আমাদের রক্ষা করেছিলেন সেটি এখনো আমার কাছে রহস্যের মতো। পুরো সময়টা আমরা রীতিমত যুদ্ধ করে টিকে রইলাম। কেউ যদি সেই কাহিনীটুকু লিখে ফেলে সেটা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মতো হয়ে যাবে। তখন লেখাপড়া শেষ করার জন্য প্রথমে আমি তারপর হুমায়ূন আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছি। হুমায়ূন আহমেদ আগে,

আমি তার অনেক পরে দেশে ফিরে এসেছি। হুমায়ূন আহমেদের আগেই সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি ছিল, ফিরে এসে সে যখন লেখালেখির পাশাপাশি টেলিভিশনের নাটক লেখা শুরু করল হঠাত্ করে তার জনপ্রিয়তা হয়ে গেলো আকাশছোঁয়া। দেশে ফিরে এসে প্রথমবার বই মেলায় গিয়ে তার জনপ্রিয়তার একটা নমুনা দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম!

এতোদিনে আমাদের ভাইবোনেরা বড় হয়েছে, সবারই নিজেদের সংসার হয়েছে। বাবা নেই, মা আছেন, সবাইকে নিয়ে আবার নতুন এক ধরনের পরিবার। হুমায়ূন আহমেদের হাতে টাকা আসছে, সে খরচও করছে সেভাবে। ভাইবোন, তাদের স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে-সবাইকে নিয়ে সে দিল্লী না হয় নেপাল চলে যাচ্ছে। ঈদের দিন সবাই মিলে হৈ চৈ করছে। সবকিছু কেউ যদি গুছিয়ে লিখে ফেলে আবার সেটি একটি উপন্যাস হয়ে যাবে। এবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস।

এক সময় আমাদের সেই হাসিখুশী জীবনে আবার বিপর্যয় নেমে এলো। তিন মেয়ে আর এক ছেলে নিয়ে আমার ভাবী আর হুমায়ূন আহমেদের বিয়ে ভেঙ্গে গেল। কেন ভেঙ্গে গেল, কীভাবে ভেঙ্গে গেল সেটি গোপন কোনো বিষয় নয়। দেশের সবাই সেটি জানে। আমি তখন একদিন হুমায়ূন আহমেদের সাথে দেখা করে তাকে বললাম, দেখো তুমি তো এ দেশের একজন খুব বিখ্যাত মানুষ, তোমার যদি শরীর খারাপ হয় তাহলে দেশের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত তোমাকে দেখতে চলে আসেন। তোমার তুলনায় ভাবী তার ছেলেমেয়ে নিয়ে খুব অসহায়, তার কেউ নেই। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি টিংকুভাবীর সাথে থাকি? তোমার তো আর আমার সাহায্যের দরকার নেই। ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাবীর হয়তো সাহায্যের দরকার।

হুমায়ূন আহমেদ আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, ঠিক আছে, তুই টিংকুর সাথে থাক।

সেই থেকে আমরা টিংকু ভাবীর সাথে ছিলাম, তার জন্য সেরকম কিছু করতে পারিনি, শুধু হয়তো মানসিকভাবে পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। ভাইয়ের স্ত্রী না হয়েও যেন আমাদের পরিবারের একজন হয়ে থাকতে পারে সবাই মিলে সেই চেষ্টা করেছি। খুব স্বাভাবিকভাবে ধীরে ধীরে হুমায়ূন আহমেদের সাথে একটা দূরত্ব তৈরি হতে শুরু করেছিল। মায়ের কাছ থেকে তার খবর নিই। বেশিরভাগ সময় অবশ্যি খবরের কাগজেই তার খবর পেয়ে যাই। সে অনেক বিখ্যাত, অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, তার জীবন অনেক বিচিত্র, সেই জীবনের কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে তার উপর যে অভিমান হয়নি তা নয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেনে নিয়েছি। পরিবর্তিত জীবনে তার চারপাশে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী, তার অনেক বন্ধু, তার অনেক ক্ষমতা, তার এই নতুন জীবনে আমার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়নি।

গত বছর এরকম সময়ে হঠাত্ করে মনে হল এখন তার পাশে আমার থাকা প্রয়োজন। ক্যান্সারের চিকিত্সা করার জন্য নিউইয়র্ক গিয়েছে, সবকিছু ভালোভাবে হয়েছে। শেষ অপারেশনটি করার আগে দেশ থেকে ঘুরে গেল, সুস্থ সবল একজন মানুষ। যখন অপারেশন হয় প্রতি রাতে ফোন করে খোঁজ নিয়েছি, সফল অপারেশন করে ক্যান্সারমুক্ত সুস্থ একজন মানুষ বাসায় তার আপনজনের কাছে ফিরে গেছে, এখন শুধু দেশে ফিরে আসার অপেক্ষা। তারপর হঠাত্ করে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল, সার্জারী পরবর্তীতে অবিশ্বাস্য একটি জটিলতার কারণে তাকে আবার হাসপাতালে ফিরে যেতে হল। আমি আর আমার স্ত্রী চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে নিউইয়র্কে হাজির হলাম। ব্রুকলিন নামের শহরে আমার ছেলেমেয়েরা আমাদের জন্য একটা এপার্টমেন্ট ভাড়া করে রেখেছে। সেখানে জিনিসপত্র রেখে বেলভিউ হাসপাতালে ছুটে গেলাম। প্রকাশক মাজহার আমাদের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে গেলেন, সেখানে তার স্ত্রী শাওনের সাথে দেখা হল। উঁচু বিছানায় নানা ধরনের যন্ত্রপাতি হুমায়ূন আহমেদকে ঘিরে রেখেছে। তাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। অবস্থা একটু ভালো হলে তাকে জাগিয়ে তোলা হবে।

আমরা প্রতিদিন কাকডাকা ভোরে হাসপাতালে যাই, সারাদিন সেখানে অপেক্ষা করি, গভীর রাতে ব্রুকলিনে ফিরে আসি। হুমায়ূন আহমেদকে আর জাগিয়ে তোলা হয় না। আমি এতো আশা করে দেশ থেকে ছুটে এসেছি তার হাত ধরে চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলব, অভিমানের যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল মুহূর্তে সেই দূরত্ব দূর হয়ে যাবে, কিন্তু সেই সুযোগটা পাই না। ইনটেনসিভ কেয়ারের ডাক্তারদের সাথে পরিচয় হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, এতোদিনে তারা বিছানায় অসহায়ভাবে শুয়ে থাকা মানুষটির গুরুত্বের কথাও জেনে গেছে। তারা আমাকে বলল, হুমায়ূন আহমেদ ঘুমিয়ে থাকলেও তারা তোমাদের কথা শুনতে পায়। তার সাথে কথা বলো। তাই যখন আশেপাশে কেউ না থাকে তখন আমি তার সাথে কথা বলি। আমি তাকে বলি দেশের সব মানুষ, সব আপনজন তার ভালো হয়ে ওঠার জন্য দোয়া করছে। আমি তাকে মায়ের কথা বলি, ভাইবোনদের কথা বলি, ছেলেমেয়ের কথা বলি। সে যখন ভালো হয়ে যাবে তখন তার এই চেতন-অচেতন রহস্যময় জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে কী অসাধারণ বই লিখতে পারবে তার কথা বলি। তার কাছে সবকিছু স্বপ্নের মত মনে হলেও এটা যে স্বপ্ন নয় আমি তাকে মনে করিয়ে দিই, দেশ থেকে চলে এসে তখন আমি যে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি এটা যে সত্যি, সেটা তাকে বিশ্বাস করতে বলি।

ঘুমন্ত হুমায়ূন আহমেদ আমার কথা শুনতে পারছে কী না সেটা জানার কোনো উপায় নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারি সে শুনছে, কারণ তার চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা চোখের পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে।

আমি অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকি।

একদিন হুমায়ূন আহমেদের সবচেয়ে ছোট মেয়ে বিপাশা তার বাবাকে দেখতে এলো। যে কারণেই হোক বহুকাল তারা বাবার কাছে যেতে পারেনি। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে সে যখন গভীর মমতায় তার বাবার কপালে হাত রেখে তাকে ডাকল, কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে কথা বলল, আমরা দেখলাম আবার তার দুই চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল। সৃষ্টিকর্তা আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন, মনে হয় সে জন্যই এই দুঃখগুলো দিতেও কখনো কার্পণ্য করেননি।

১৯ জুলাই অন্যান্য দিনের মত আমি হাসপাতালে গিয়েছি, ভোর বেলা হঠাত্ করে আমার মা আমাকে ফোন করলেন। ফোন ধরতেই আমার মা হাহাকার করে বললেন, আমার খুব অস্থির লাগছে। কী হয়েছে বল। আমি অবাক হয়ে বললাম, কী হবে, কিছুই হয়নি। প্রত্যেকদিন যেরকম হাসপাতালে আসি আজকেও এসেছি। সবকিছু অন্যদিনের মতো, কোনো পার্থক্য নেই। আমার মায়ের অস্থিরতা তবুও যায় না, অনেক কষ্ট করে তাকে শান্ত করে ফোনটা রেখেছি, ঠিক সাথে সাথে আমার কাছে খবর এলো আমি যেন এই মুহূর্তে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে যাই। হুমায়ূন আহমেদ মারা যাচ্ছে। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, তথ্য কেমন করে পাঠানো সম্ভব তার সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আমি জানি। কিন্তু পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে একজন মা কেমন করে তার সন্তানের মৃত্যুক্ষণ নিজে থেকে বুঝে ফেলতে পারে আমার কাছে তার ব্যাখ্যা নেই।

আমি দ্রুত ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে গিয়েছি। হুমায়ূন আহমেদের কেবিনে সকল ডাক্তার ভিড় করেছে, তার চিকিত্সার দায়িত্বে থাকা ড. মিলারও আছেন। আমাদের দেখে অন্যদের বললেন, আপনজনদের কাছে যাবার ব্যবস্থা করে দাও। আমি বুঝতে পারলাম হুমায়ূন আহমেদকে বাঁচিয়ে রাখার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এখন তাকে চলে যেতে দিতে হবে।

আমার স্ত্রী ইয়াসমিন আমাকে বলল, আমার মাকে খবরটা দিতে হবে। ১৯৭১ সালে আমি আমার মাকে আমার বাবার মৃত্যুসংবাদ দিয়ে তার সারাটা জীবন ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলাম। এতোদিন পর আবার আমি নিষ্ঠুরের মতো তাকে তার সন্তানের আসন্ন মৃত্যুর কথা বলব? আমি অবুঝের মতো বললাম, আমি পারব না। ইয়াসমীন তখন সেই নিষ্ঠুর দায়িত্বটি পালন করল, মুহূর্তে দেশে

আমার মা, ভাইবোন সব আপনজনের হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে সব স্বপ্ন, সব আশা এক ফুত্কারে নিভে গেল।

কেবিনের ভেতর উঁচু বিছানায় শুয়ে থাকা হুমায়ূন আহমেদকে অসংখ্য যন্ত্রপাতি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, তার কাছে শাওন দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে ডেকে হুমায়ূন আহমেদকে পৃথিবীতে ধরে রাখতে চাইছে। আমরা বোধশক্তিহীন মানুষের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যে তরুণ ডাক্তার এতোদিন প্রাণপণ চেষ্টা করে এসেছে সে বিষণ্ন গলায় আমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করল, বলল, আর খুব বেশি সময় নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ও কী কষ্ট পাচ্ছে? তরুণ ডাক্তার বলল, না, কষ্ট পাচ্ছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেমন করে জান? সে বলল, আমরা জানি, তাকে আমরা যে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি তাতে তার কষ্ট হবার কথা নয়। এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। এরকম অবস্থা থেকে যখন কেউ ফিরে আসে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার এখন কেমন লাগছে? সে বলল, স্বপ্ন দেখার মতো। পুরো বিষয়টা তার কাছে মনে হচ্ছে একটা স্বপ্নের মতো।

একটু পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি কোনো জাদুমন্ত্র বলে হঠাত্ সে জ্ঞান ফিরে পায়, হঠাত্ সে বেঁচে উঠে তাহলে কী সে আবার হুমায়ূন আহমেদ হয়ে বেঁচে থাকবে? তরুণ ডাক্তার বলল, এখন যদি জেগে উঠে তাহলে হবে, একটু পরে আর হবে না। তার ব্লাডপ্রেশার দ্রুত কমছে, তার মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ কমছে, মস্তিষ্কের নিউরন সেল ধীরে ধীরে মারা যেতে শুরু করেছে।

আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কমবয়সী তরুণী একজন নার্স তার মাথার কাছে সবগুলো যন্ত্রপাতির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হুমায়ূন আহমেদের জীবনের শেষ মুহূর্তটি যেন কষ্টহীন হয় তার নিশ্চয়তা দেয়ার চেষ্টা করছে। চারপাশে ঘিরে থাকা যন্ত্রপাতিগুলো এতোদিন তাকে বাঁচিয়ে রেখে যেন ক্লান্ত হয়ে গেছে, একটি একটি যন্ত্র দেখাচ্ছে খুব ধীরে ধীরে তার জীবনের চিহ্নগুলো মুছে যেতে শুরু করেছে। ব্লাড প্রেশার যখন আরো কমে এসেছে আমি তখন তরুণ ডাক্তারকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, এখন? এখন যদি হুমায়ূন আহমেদ বেঁচে উঠে তাহলে কী হবে? ডাক্তার মাথা নেড়ে বলল, যদি এখন অলৌকিকভাবে তোমার ভাই জেগে উঠে সে আর আগের মানুষটি থাকবে না। তার মস্তিষ্কের মাঝে অনেক নিউরণ সেল মারা গেছে।

আমি নিঃশব্দে হুমায়ূন আহমেদকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় জানালাম। তার দেহটিতে এখনো জীবনের চিহ্ন আছে, কিন্তু আমার সামনে যে মানুষটি শুয়ে আছে সে আর অসম্ভব সৃষ্টিশীল অসাধারণ প্রতিভাবান হুমায়ূন আহমেদ নয়। যে মস্তিষ্কটি তাকে অসম্ভব একজন সৃষ্টিশীল মানুষ করে রেখেছিল তার কাছে সেই মস্তিষ্কটি আর নেই। সেটি হারিয়ে গেছে।

তরুণ ডাক্তার একটু পর ফিসফিস করে বলল, এখন তার হৃত্স্পন্দন অনিয়মিত হতে থাকবে। সত্যি সত্যি তার হৃত্স্পন্দন অনিয়মিত হতে থাকলো। ডাক্তার একটু পর বলল, আর মাত্র কয়েক মিনিট।

আমি বোধশক্তিহীন মানুষের মত দাঁড়িয়েছিলাম। এবারে একটু কাছে গিয়ে তাকে ধরে রাখলাম। যে যন্ত্রটিতে এতোদিন তার হৃত্স্পন্দন স্পন্দিত হয়ে এসেছে সেটা শেষবার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চিরদিনের মতো থেমে গেল। মনিটরে শুধু একটি সরল রেখা, আশ্চর্য রকম নিষ্ঠুর একটি সরল রেখা। হুমায়ূন আহমেদের দেহটা আমি ধরে রেখেছি, কিন্তু মানুষটি চলে গেছে।

ছোট একটি ঘরের ভেতর কী অচিন্তনীয় বেদনা এসে জমা হতে পারে আমি হতবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমি আর ইয়াসমিন ঢাকা ফিরেছি বাইশ তারিখ ভোরে। এয়ারপোর্ট থেকে বের হবার আগেই অসংখ্য টেলিভিশন ক্যামেরা আমাদের ঘিরে ধরল। আমি নতুন করে বুঝতে পারলাম হুমায়ূন আহমেদের জন্য শুধু তার আপনজনেরা নয়, পুরো দেশ শোকাহত।

এর পরের কয়েকদিনের ঘটনা আমি যেটুকু জানি এই দেশের মানুষ তার থেকে অনেক ভালো করে জানে। একজন লেখকের জন্য একটা জাতি এভাবে ব্যাকুল হতে পারে আমি নিজের চোখে না দেখলে কখনো বিশ্বাস করতাম না। কোথায় কবর দেয়া হবে সেই সিদ্ধান্তটি শুধু আপনজনদের বিষয় থাকল না, হঠাত্ করে সেটি সারা দেশের সব মানুষের আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। টেলিভিশনের সব চ্যানেল একান্তই একটা পারিবারিক বিষয় চব্বিশ ঘন্টা দেখিয়ে গেছে এতোদিন পরও আমার সেটা বিশ্বাস হয় না। পরে আমি অনেককে প্রশ্ন করে বুঝতে চেয়েছি এটা কী একটা স্বাভাবিক বিষয় নাকি মিডিয়ার তৈরি করা একটা কৃত্রিম হাইপ। সবাই বলেছে এটি হাইপ ছিল না, দেশের সব মানুষ সারাদিন সারারাত নিজের আগ্রহে টেলিভিশনের সামনে বসেছিল। একজন লেখকের জন্য এতো তীব্র ভালোবাসা মনে হয় শুধু এই দেশের মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

হুমায়ূন আহমেদ কি শুধু জনপ্রিয় লেখক নাকি তার লেখালেখির সাহিত্য-মর্যাদাও আছে সেটি বিদগ্ধ মানুষের একটি প্রিয় আলোচনার বিষয়। আমি সেটি নিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি। কারো কাছে মনে হতে পারে দশ প্রজন্মের এক হাজার লোক একটি সাহিত্যকর্ম উপভোগ করলে সেটি সফল সাহিত্য! আবার কেউ মনে করতেই পারে তার দশ প্রজন্মের পাঠকের প্রয়োজন নেই, এক প্রজন্মের এক হাজার মানুষ পড়লেই সে সফল। কার ধারণা সঠিক সেটি কে বলবে? আমি নিজেও যেহেতু অল্পবিস্তর লেখালেখি করি তাই আমি জানি একজন লেখক কখনোই সাহিত্য সমালোচকের মন জয় করার জন্যে লিখেন না, তারা লিখেন মনের আনন্দে। যদি পাঠকেরা সেই লেখা গ্রহণ করে সেটি বাড়তি পাওয়া। হুমায়ুন আহমেদের লেখা শুধু যে পাঠকেরা গ্রহণ করছিল তা নয়, তার লেখা কয়েক প্রজন্মের পাঠক তৈরি করেছিল। বড় বড় সাহিত্য সমালোচকেরা তার লেখাকে আড়ালে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন কিন্তু ঈদ সংখ্যার আগে একটি লেখার জন্যে তার পিছনে ঘুরঘুর করেছেন- সেটি আমাদের সবার জন্যে একটি বড় কৌতুকের বিষয় ছিল। কয়েকদিন আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনী সংস্থার কর্ণধারের সাথে কথা হচ্ছিল, কথার ফাঁকে একবার জিজ্ঞেস করলাম, "আপনাদের কাছে কি হুমায়ূন আহমেদের কোনো বই আছে?"

প্রশ্নটি শুনে ভদ্রলোকের মুখটি কেমন যেন ম্লান হয়ে গেল। দুর্বল গলায় বললেন, হুমায়ূন আহমেদ যখন প্রথম লিখতে শুরু করেছে তখন সে তার একটা উপন্যাসের পান্ডুলিপি নিয়ে তাদের প্রকাশনীতে এসেছিল। তাদের প্রকাশনীতে বড় বড় জ্ঞানীগুণী মানুষ নিয়ে রিভিউ কমিটি ছিল, পান্ডুলিপি পড়ে রিভিউ কমিটি সুপারিশ করলেই শুধুমাত্র বইটি ছাপা হতো। হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসটি পড়ে রিভিউ কমিটি সেটাকে ছাপানোর অযোগ্য বলে বাতিল করে দিল। প্রকাশনীটি তাই সেই পান্ডুলিপি না ছাপিয়ে হুমায়ূন আহমেদকে ফিরিয়ে দিয়েছিল!

গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনীটির কর্ণধারের মুখ দেখে আমি টের পেয়েছিলাম তিনি তার প্রকাশনীর রিভিউ কমিটির সেই জ্ঞানী-গুণী সদস্যদের কোনোদিন ক্ষমা করেননি। করার কথা নয়।

হুমায়ূন আহমেদ তিন শতাধিক বই লিখেছে, তার উপরেও গত বছরে সম্ভবত প্রায় সমান সংখ্যক বই লেখা হয়েছে। কতো বিচিত্র সেই বইয়ের বিষয়বস্তু। তার জন্য গভীর ভালোবাসা থেকে লেখা বই যেরকম আছে ঠিক সেরকম শুধুমাত্র টু-পাইস কামাই করার জন্যে লেখা বইয়েরও অভাব নেই। লেখক হিসেবে আমাদের পরিবারের কারো নাম দিয়ে গোপনে বই প্রকাশ

করার চেষ্টা হয়েছে, শেষ মুহূর্তে থামানো হয়েছে এরকম ঘটনাও জানি। হুমায়ূন আহমেদ চলে যাবার পর মানুষের তীব্র ভালোবাসার কারণে ইন্টারনেটে নানা ধরনের আবেগের ছড়াছড়ি ছিল, সে কারণে মানুষজন গ্রেপ্তার পর্যন্ত হয়েছে, হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে ছাড়াও পেয়েছে। তার মৃত্যু নিয়ে নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা আছে, কাজেই কোনো কোনো বই যে বিতর্ক জন্ম দেবে তাতেও অবাক হবার কিছু নেই। তাই আমি যখন দেখি কোনো বইয়ের বিরুদ্ধে জ্ঞানী-গুণী মানুষেরা বিবৃতি দিচ্ছেন, সেই বই নিষিদ্ধ করার জন্যে মামলা-মোকদ্দমা হচ্ছে, আমি একটুও অবাক হই না। শুধু মাঝে মাঝে ভাবি হুমায়ূন আহমেদ যদি বেঁচে থাকতো তাহলে এই বিচিত্র কর্মকান্ড দেখে তার কী প্রতিক্রিয়া হতো?

কেউ যেন মনে না করে তাকে নিয়ে শুধু রাগ দুঃখ ক্ষোভ কিংবা ব্যবসা হচ্ছে, আমাদের চোখের আড়ালে তার জন্যে গভীর ভালোবাসার সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা জগত্ রয়েছে। আমি আর আমার স্ত্রী ইয়াসমীন যখন হুমায়ূন আহমেদের পাশে থাকার জন্য নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম তখন একজন ছাত্রের সাথে পরিচয় হয়েছিল। সে হুমায়ূন আহমেদের সেবা করার জন্যে তার কেবিনে বসে থাকতো। শেষ কয়েক সপ্তাহ যখন তাকে অচেতন করে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হলো তখনো এই ছেলেটি সারারাত হাসপাতালে থাকতো। হুমায়ূন আহমেদ যখন আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখনো সে আমাদের সাথে ছিল। সেই দিন রাতে এক ধরনের ঘোর লাগা অবস্থায় আমরা যখন নিউইয়র্ক শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি তখনো এই ছেলেটি নিঃশব্দে আমাদের সাথে হেঁটে হেঁটে গেছে।

দেশে ফিরে এসে মাঝে মাঝে তার সাথে যোগাযোগ হয়। শেষবার যখন তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে সে বলেছে এখনো মঝে মাঝে সে বেলভিউ হাসপাতালে গিয়ে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে বসে থাকে।

কেন বসে থাকে আমি জানি না। আমার ধারণা সে নিজেও জানে না। শুধু এইটুকু জানি এই ধরনের অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। মনে হয় এই ভালোবাসাটুকুই হচ্ছে জীবন।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
জুলাই ২০, ২০১৩